হারিয়ে যাওয়া হায়দারাবাদ

আবদুল হাই শিকদার

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

মুখবন্ধ

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট, ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর ভারত ও পাকিস্তানের সাথেই স্বাধীনতা অর্জন করে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশে পরিণত হয় হায়দারাবাদ। লাভ করে জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি। কিন্তু হায়দারাবাদের ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে ওঠে দুর্যোগের মেঘ। দেশটির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে কোনোক্রমেই মেনে নিতে পারছিল না ভারত। ফলে হায়দারাবাদকে গ্রাস করার জন্য 'নেহেরু ডকট্রিন'-কে সামনে নিয়ে বিস্তার করতে থাকে ষড়যন্ত্রের জাল। হায়দারাবাদের দেশপ্রেমিক জনতা তাদের সেসব চক্রান্তের মোকাবিলা করতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত ক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ ভারত স্বাধীনতা লাভের মাত্র ১ বছর ২৯ দিন পর ১৯৪৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর 'অপারেশন পলো' নামে পুলিশ অ্যাকশনের আড়ালে বিশাল সামরিক বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে হায়দারাবাদের ওপর। পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করে ভারতীয় বাহিনী শহর-বন্দর-গ্রাম ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে যেতে থাকে রাজধানীর দিকে। মরণপণ লড়াই করেও বিশাল ভারতীয় বাহিনীর কাছে ১৮ সেপ্টেম্বর পরাজিত হয় হায়দারাবাদ। ভারতীয় বাহিনী মেতে ওঠে নারকীয় গণহত্যায়। লাখ লাখ মানুষ প্রাণ হারায় ভারতীয় বাহিনীর হাতে। ধর্ষিত হয় লক্ষাধিক নারী। খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠনের মাধ্যমে হায়দারাবাদকে বিভীষিকার মধ্যে নিক্ষেপ করে উত্তোলিত হয় ভারতীয় পতাকা। ভারত অতি দ্রুত হায়দারাবাদকে খণ্ডবিখণ্ড করে মিশিয়ে দেয় তার বিভিন্ন রাজ্যের সাথে। বিশ্ব মানচিত্র থেকে মুছে যায় হায়দারাবাদের অস্তিত্ব। এখন হায়দারাবাদ বলতে টিকে আছে শুধু একটি শহর।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রজন্ম ইতিহাসের এই ভয়ানক ঘটনা সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানে না। ভারতীয় আধিপত্য ও সম্প্রসারণবাদ সম্পর্কে তাদের ধারণা বড়োজোর সিকিম পর্যন্ত। ফলে ভারতের ছদ্মবেশী অহিংসার বাণীর ভেতরে তারা কোনো দোষ খুঁজে পায় না। এই অভাব থেকেই হায়দারাবাদ ট্রাজেডিকে সামনে নিয়ে আসা। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে হায়দারাবাদ ট্রাজেডি থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্ণিল ও নানামাত্রিক ষড়যন্ত্র, প্রলোভনের হাতছানি এড়িয়ে নিজ মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আরেকটু সচেষ্ট হয়, তারও একটা আকুতি মিশে আছে এই গ্রন্থের অন্তরে।

এই গ্রন্থের সবগুলো পর্বই ২৯ জানুয়ারি, ২০১২ থেকে ৩ জুন, ২০১২ তারিখের মধ্যে *দৈনিক আমার দেশ*-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশের ব্যবস্থা করে দেন

দুঃসময়ের সাহসী মানুষ, কারা নির্যাতিত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান। তার কাছে আমার অশেষ ঋণ। *আমার দেশ*-এর সহকর্মীদের কাছেও আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। প্রকাশের পর থেকেই বই আকারে বের করার তাগাদা দিচ্ছিলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। তাদের আগ্রহও গ্রন্থাকারে প্রকাশের অন্যতম কারণ।

এই বই লিখতে গিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে দু-হাত ভরে তথ্য নিয়েছি। কিছু অংশ পরিশিষ্টে যুক্ত করেছি। সাবেক প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ও খ্যাতিমান অনুবাদক আবু জাফর এবং সিকদার আবুল কাশেম শামসুদ্দিন কয়েকটি মূল গ্রন্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। ইংরেজি অংশগুলো অনুবাদ করে দিয়েছে আমার আত্মজ পরম ওয়াজেদ শিকদার। আমার অনুজতুল্য হাসনাইন ইকবালও দৌড়ঝাঁপ করেছে বিস্তর। প্রকাশক মিজানুর রহমান সরদার (মিলন)-তো আছেই আমার পাশে। এদের ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করি কোন মুখে।

আবদুল হাই শিকদার
১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

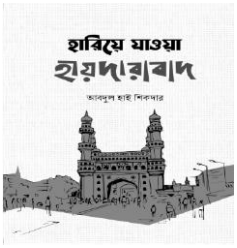

চোখের পাপড়িগুলো পর্যন্ত বরফ-সাদা। আর অবিরল তুষারপাতের ভেতর দিয়ে টিউব রেলওয়ে হয়ে পায়ে হেঁটে আমি এসেছি। পেঁজা তুলার মতো জমাট তুষার এখানে-ওখানে। গাছের পাতায়। ট্রাফিক সিগন্যালের মাথায়। ফুটপাথে। পুরো ওডারকোটে মোড়ানো আমার শরীর দেখে যে কারও মনে হতেই পারত, 'এ মুভিং প্যাকেট অভ গুডস'। আমার সে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, স্তূপ স্তূপ বরফ আমার পায়ের নিচে বিছিয়ে রেখেছে রাজ্যের শুভ্রতা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের দাঁতের চেয়েও সে শুভ্রতা নিষ্ঠুর এবং একই রকম শীতল। আমার জুতার তলা দিয়ে ঠান্ডা ঢুকতে থাকে। অনুভব করি কনকনে বাতাস বরফাচ্ছন্নতাকে আরও উসকে দিয়ে কাঁপন ধরাতে এগিয়ে আসছে আমার রক্তে। সঙ্গী নাইমুল হক সেই সময় কড়া নাড়ে আকাঙ্ক্ষিত দরজায়। ১৯৯৫ সালের শীতে বিকালের লন্ডন দরজা খুলেই হাত বাড়ায়, 'আহলান সাহলান, খোশ আমদিদ।'

ভদ্রলোকের মাথার চুলগুলো লন্ডনের বরফের চাইতেও সাদা। মুখভর্তি তারও চেয়ে সাদা সুবিন্যস্ত দাড়ি। পরনের পোশাকে এখনও লেগে আছে ওরিয়েন্টাল আভিজাত্যের ঘ্রাণ। দুধের সঙ্গে আলতা মেশানো গায়ের রং। হাত যখন বাড়ালেন আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। হাতের প্রতিটি পশমে পর্যন্ত শ্বেত সৌন্দর্যের কারুকাজ। পুরুষ্টু হাতটি আমি হাতের মধ্যে নিলাম। তিনি আমাকে ভেজা ওভারকোটসহই জড়িয়ে নিলেন বুকে, 'ভাই সাহেব, কতদিন পরে আমার তরুণ ভাই খোঁজ নিতে এসেছে এই বদনসিবের।'

বললাম, বদনসিব হবেন কেন? তাসাদ্দুক ভাই আপনার সম্পর্কে আমাকে যা বলে দিয়েছেন, তা থেকে আমার ধারণা হয়েছে, আপনি এক অসাধারণ মানুষ। আর তাসাদ্দুক ভাইয়ের মতো লোক তো যে কারও সম্পর্কে যা খুশি তা বলতে পারেন না।

স্মিত হেসে আমাকে হাত ধরে ড্রয়িংরুমে নিয়ে তাজিমের সঙ্গে বসালেন। বাইরের ঠান্ডা রুমের উষ্ণতায় দ্রুত কেটে যাচ্ছে টের পাচ্ছি। এর মধ্যে কফি চলে এলো। গরম কফিতে চুমুক দিতে দিতে তাসাদ্দুক ভাই, মানে সেই সময়কার লন্ডনে বাংলাদেশিদের সব অগতির গতি তাসাদ্দুক আহমদের কথা ভাবছিলাম। তিনি আমাকে এই মানুষটির

কাছে পাঠিয়ে বললেন, সৈয়দ কুতুবউদ্দিন সাহেব লন্ডনে এসেছেন সেই ১৯৪৯ সালে। তুমি তো ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করো। তার কাছে উপমহাদেশের ইতিহাসের বেশ কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়ে গেছে। একটা স্বাধীন দেশকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছিল তার জীবন্ত সাক্ষী তিনি। জানাশোনা লোক। একসময় লেখালিখি করতেন, এখন করেন না। বলেন, 'এ জীবনে তো আর মাতৃভূমির স্বাধীনতা উদ্ধার করতে পারলাম না। এখন তো জীবনে লেগেছে ভাটার টান। আর পেছনে ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করে না। এখন চিরতরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি।' তবুও তুমি তার কাছে যাও। স্বাধীন হায়দারাবাদ কীভাবে ছয় দিনের যুদ্ধে ভারত দখল করে নিয়েছিল, তার বিস্তারিত কথা শুনতে পাবে তার কাছে।

তাসাদ্দুক ভাইয়ের নির্দেশ মানতে এবং আমার অন্তরের আগ্রহ পূরণ করতেই এই শীতের বরফ ঠেলে এখানে আসা।

কফির কাপ টেবিলে রাখতে রাখতে বললাম, আপনার কথা বলুন। আপনার দেশের কথা বলুন। কুতুবউদ্দিন সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, আমার নিজের কোনো কথা নেই। আর আমার কোনো দেশ নেই। আমি হলাম দেশহীন এক মানুষ। ১৯৪৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর আমার দেশ দখল করে নিয়েছে ভারত।

বললাম, সেই হায়দারাবাদের কথাই বলুন। সৈয়দ কুতুবউদ্দিন বিখ্যাত উর্দু কবি দাগের গজল শোনালেন আমাদের :

দিল্লি সে চলে দাগ, করো সায়র ডেকান কি,
গওহর কি হুয়ি কদর, সমুন্দর সে নিকাল কে।
হায়দারাবাদ রহে তা-বা, কেয়ামত কায়েম
এহি, অ্যায় দাগ, মুসলমান কি এক বসতি হ্যায়।

[হে দাগ, দিল্লি ছাড়। দাক্ষিণাত্যের পথে ভ্রমণ কর। মুক্তার দাম তো তখনই হয়, যখন সে সমুদ্রের বাইরে আসতে পারে। হায়দারাবাদ কিয়ামত পর্যন্ত উজ্জ্বল থাক, চিরঞ্জীব হোক; কারণ এই তো একমাত্র স্থান, যেখানে মুসলমানরা বাস করতে পারে।]

কবি দাগের সেই শুভকামনা পূর্ণ হয়নি। পূর্ণ হতে দেওয়া হয়নি। স্বাধীন হায়দারাবাদ বেঁচে থাকেনি। বেঁচে থাকতে পারেনি। বেঁচে থাকতে দেওয়া হয়নি। মুসলমানদের আবাসস্থল হয়েও সে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেনি। দাগের কবিতা লেখার ৫০ বছরের মধ্যে হায়দারাবাদ ভারতীয় আধিপত্যবাদের শিকারে পরিণত হয়ে রাষ্ট্র হিসেবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

বিশ্বমানচিত্র থেকে মুছে গেছে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের নামনিশানা। ভারতীয় বাহিনী হায়দারাবাদ দখলের পর প্রথমেই ভেঙে দিয়েছিল এর সেনাবাহিনী। সব

দেশপ্রেমিককে করেছিল শৃঙ্খলিত। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল উর্দুকে। নিষিদ্ধ হয়েছিল জাতীয় সংগীত। এভাবে রাষ্ট্র হিসেবে হায়দারাবাদের বিলুপ্তির ঘোষণা করে ভাষার ভিত্তিতে একে তিন টুকরো করা হলো। এক টুকরো দেওয়া হলো অন্ধ্রকে, এক টুকরো মহারাষ্ট্রের সঙ্গে, অন্য টুকরো বিলীন করে দেওয়া হলো মহিশুরের সঙ্গে। আমার দেশ হায়দারাবাদ রাষ্ট্রের শেষ ও একমাত্র চিহ্ন হিসেবে টিকে রইল শুধু শহর হায়দারাবাদ।

সৈয়দ কুতুবউদ্দিনের চোখ চলে যায় সুদূর অতীতে। তার ফেলে আসা যৌবনে। তার হায়দারাবাদে। তার শৈশব, তার কৈশোরে। নিজের ফেলে আসা গৃহের আঙিনায়। হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে নিমিষে তার হৃদয় লন্ডন থেকে চলে যায় হারিয়ে যাওয়া হায়দারাবাদে। টানা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার কথা বলতে শুরু করেন, আমি কি বেশি কথা বলছি?

বললাম, ঠিক আছে, আপনি বলুন।

তিনি বললেন, কী করব, আমি ছাড়া আজকের পৃথিবীতে বিলুপ্ত হায়দারাবাদের জন্য কথা বলার লোক, চোখের পানি ফেলার লোক হয়তো আর নেই।

অনেকক্ষণ চুপ থেকে আবার বলতে শুরু করেন সৈয়দ কুতুবউদ্দিন—

১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮। আমাদের স্বাধীনতা লাভের মাত্র এক বছর তিন মাসের মাথায়। তখন আমি মাত্র ৩১ বছরের যুবক। সদ্য বিয়ে করেছি মাতৃভূমির গৌরবে গৌরবান্বিত বুক নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে দেশের জন্য কাজ করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছি কর্মক্ষেত্রে। অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হায়দারাবাদে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। হায়দারাবাদে কেউ কখনো না খেয়ে মরেনি। শিক্ষার হার ছিল উপমহাদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। সর্বত্র শান্তি আর সদ্য স্বাধীনতা লাভের আনন্দ। সেই সময় যখন আমরা কেবল ঘর গোছাচ্ছিলাম, দেশকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য কাজ করছিলাম, যখন কেবল মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছি। আমার সদ্য বিয়ে করা বিদুষী স্ত্রী বলত, সারাক্ষণ দেশ দেশ করে বাইরে থাকো। এবার ঘরের দিকে একটু মন দাও। বলতাম, ঘরকে সুন্দর করার জন্যই দেশকে সুন্দর করার কাজে মন দিয়েছি। তোমাকে, তোমার ঘরকে ভালোবাসি বলেই তো দেশকে ভালোবাসি।

স্ত্রী প্রসঙ্গ আসাতে বিমর্ষ হয়ে গেলেন কুতুবউদ্দিন সাহেব। ৭৮ বছরের প্রবীণ চোখে কি পানি এলো? আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই কায়দা করে চোখ মুছে নিলেন বৃদ্ধ।

বলে চললেন, সেই সময় ১৯৪৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো পৃথিবীর সব নীতি-নিয়ম, জাতিসংঘের সনদ দু-পায়ে মাড়িয়ে হিংস্র হায়েনার মতো

চারদিক থেকে হায়দারাবাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ভারতীয় সেনাবাহিনী। শত শত ট্যাংক, কামানের গর্জনে প্রকম্পিত হলো হায়দারাবাদের আকাশ-বাতাস-জমিন। ভারতের বোমারু বিমানগুলোর নির্বিচার বোমাবর্ষণে ক্ষতবিক্ষত হলো ৫ শ বছর ধরে গড়ে ওঠা সুন্দর দেশ হায়দারাবাদ।

উন্মত্তের মতো মুসলিম হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠল ভারতীয় সেনাবাহিনী। কারণ, তারাই ছিল হায়দারাবাদের স্বাধীনতা রক্ষার মূল চালিকাশক্তি। শহর, বন্দর, বাজার, গ্রাম, গঞ্জ ধ্বংস করে মাইলের পর মাইল বাড়িঘর, মসজিদ, মাদরাসা, স্কুল, কলেজ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে রাজধানীর দিকে এগোতে থাকল ভারতীয় বাহিনী। প্রথম দুই দিনেই ৭০ হাজারের মতো নিরীহ সাধারণ মানুষ নিহত হলো ভারতীয় সৈন্যদের হাতে। ধর্ষিত হলো ৩০ হাজারের মতো মা-বোন। মানবসভ্যতার এত বড়ো বিপর্যয়ের মুখেও সেদিন মুখে কুলুপ এঁটে নীরব-নিঃশব্দ হয়ে বসে রইল বিশ্ববিবেক।

এমনকি মুসলিম দেশগুলো পর্যন্ত সেদিন সাহায্য তো দূরের কথা, এই ভয়াবহ আগ্রাসানের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি। এই নীরবতা, এই নিঃসঙ্গতা, এই জঘন্য উদাসীনতার কারণ কী ছিল, জাতিসংঘই-বা কেন সেদিন নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন ডাকতে বিলম্ব করল—তা আজও রহস্যাবৃতই হয়ে আছে। জাতিসংঘসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের কথা না হয় বাদই দিলাম, মুসলিম দেশগুলো কেন হায়দারাবাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি, তা আজও কারও বোধগম্য নয়।

কিন্তু আমরা, আমার মতো লাখ লাখ স্বাধীনতাপিপাসু মানুষ, সেদিন আমাদের যার কাছে যা ছিল তা-ই নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলাম ভারতীয় হানাদারদের বিরুদ্ধে। হায়দারাবাদের গণমানুষের প্রিয় নেতা কাশেম রিজভী বিপন্ন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য গড়ে তুলেছিলেন প্রবল প্রতিরোধ। কিন্তু অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত লক্ষাধিক সৈন্যের একটা বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় নিরস্ত্র জনতা যুদ্ধ করে টিকে থাকতে পারে কদিন?

ভারতের তল্পিবহনকারী, দালাল, সুবিধাভোগী, দেশদ্রোহীচক্র যারা নানা ছদ্মাবরণে হায়দারাবাদের জাতীয় ঐক্য, সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও নিজস্ব সংস্কৃতি ধ্বংসের জন্য কাজ করছিল; তারা এবার প্রকাশ্যে এসে হাত মেলাল ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে।

হায়দারাবাদের রাজনীতিবিদ, সমরনায়ক, বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ীদের বিরাট অংশ জাতীয় প্রতিরোধ সংগ্রামকে ভেতর থেকে ভয়ানক দুর্বল করে তুললেন। গোটা জাতিকে নানা কায়দায় পরিষ্কার দুটো ভাগে বিভক্ত করে তুলল। নানা কল্পকাহিনির জন্ম দিলো তারা। ভারতীয় পত্রপত্রিকা এক্ষেত্রে জোগালো ঢালাও সমর্থন।

ফলে আঘাত ও আগ্রাসন যখন প্রত্যক্ষভাবে এলো, তখন দ্বিধাবিভক্ত জাতির পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। এরই মধ্যে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আল ইদরুস

করলেন চরম বিশ্বাসঘাতকতা। ঠিক আপনাদের মীরজাফর যেভাবে সিরাজের সঙ্গে, মীর সাদেক যেভাবে টিপু সুলতানের সঙ্গে করেছিলেন।

তো আমাদের সব উদ্যোগ আয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেল। ফলে মাত্র ছয় দিনের যুদ্ধে ১৮ সেপ্টেম্বর পতন হলো হায়দারাবাদের। মুছে গেল হায়দারাবাদ। আহ—!

বুকে চেপে রাখা একটা কষ্ট যেন গলা দিয়ে গোঙারানির মতো বেরিয়ে এলো কুতুবউদ্দিন সাহেবের। কথা বলা বন্ধ করে বাইরে তুষারপাত দেখার দিকে যেন মন দিলেন হঠাৎ। আমরা কেউ কোনো কথা বলি না। আবার শুরু করেন বৃদ্ধ—

'যুদ্ধের ময়দানে গুলিবিদ্ধ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। সেখান থেকে কীভাবে কোথায় গিয়েছি, বলতে পারব না। আমার জ্ঞান ফিরল পরাধীন হায়দারাবাদে ওসমানিয়া হাসপাতালে। হাসপাতাল থেকে আমাকে পাঠানো হলো জেলে। জেলের ঘানি টানলাম কয়েক মাস। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হলো গোলযোগ সৃষ্টির। ভারতীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অভিযোগ এলো। অভিযোগ এলো রাষ্ট্রদ্রোহিতার! কয়েকজন ভারতীয় সৈনিক নাকি যুদ্ধক্ষেত্রে আমার গুলিতে মরেছিল।

সেই মামলা-হামলা পার হয়ে জামিন জুটল এরও ছয় মাস পর। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরে এসে দেখি, সর্বত্র পতপত করে উড়ছে ভারতীয় পতাকা। ছারখার হয়ে গেছে হায়দারাবাদ। হায়দারাবাদ যেন ধ্বংসস্তূপ হয়ে আছে। বেহুঁশের মতো ছুটলাম নিজ বাড়িতে।

আমাদের পুরো মহল্লাটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পড়ে আছে ছাইভস্ম আর পোড়ামাটি। আমার বাবা-মা, দুটি ভাই—কারোই কোনো খোঁজ পেলাম না। হয়তো বন্ধ ঘরে আটকে তাদের আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল ভারতীয় বাহিনী। হঠাৎ আমার স্ত্রী, আমার প্রিয়তমা স্ত্রী—যে একজন ভালো আইনজীবী হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তাকে খুঁজলাম। আমার এক সদাশয় স্নেহময় হিন্দু প্রতিবেশী বৃদ্ধ বললেন, "বাবা রে, সব তো শেষ হয়ে গেছে। ওরা এখানকার সহায়সম্পদ সব লুণ্ঠন করেছে। মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছে। তবে মহল্লায় ঢুকে মেয়েদের, বিশেষ করে যুবতি মেয়েদের ওরা আগেই আলাদা করে ট্রাকে উঠিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে গেছে। এর বেশি আমি কিছু জানি না।" তার পরের কয়েক মাস আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে, জীবনের ভয়কে তুচ্ছ করে আমি তন্নতন্ন করে খুঁজে বেরিয়েছি আমার বাবা-মা, ভাই ও জেবুন্নেসা—আমার স্ত্রীকে। হাসপাতাল, মর্গ, জেলখানা, পতিতাপল্লি—কোথাও বাদ দিইনি। আমার কয়েকজন হিন্দু বন্ধুর সহযোগিতায় ভারতীয় সৈন্যদের শিবিরেও খোঁজ নিয়েছি। কাউকেই পাইনি। আমি আর ওকেও খুঁজে পাইনি। ওর কী হয়েছিল, তাও কোনো দিন জানতে পারিনি। আমার মতো এ রকম হাজার হাজার স্বামী তাদের স্ত্রীদের, বাবা তাদের

ছেলেমেয়েদের খুঁজে পায়নি। হয়তো হায়দারাবাদের কোনো চিহ্নহীন গণকবরে চাপা পড়ে গেছে আমার জেবুন্নেসা, আমার বাবা-মা-ভাই। তারপর আর কী—

ওহ দিল্ নহি রহা হ্যায়, নহ্ ওহ আর নিমাগ হ্যায়,
জি এনমেঁ আপনে বুঝতাসা কোই চিরাগ হ্যায়।

[সেই হৃদয় নেই, সেই মাথাও এখন নেই। শরীরে প্রাণ আছে, কিন্তু সে যেন এক নিভু নিভু দীপ।]'

কথা বলতে বলতেই আমাদের দিকে চোখ ফেরালেন সৈয়দ কুতুবউদ্দিন। তার মুখের দিকে তাকাতে ভয় করছিল আমার। না জানি কী সেখানে দেখব। তবুও কথা শেষ হয় না তার—

'শিকদার সাহেব, আপনাদের বাংলাদেশের তুলনায় আয়তনে অনেক বড়ো দেশ ছিল আমার হায়দারাবাদ। শুধু আয়তনের দিক থেকেই নয়; সম্পদ, সমৃদ্ধি, সামর্থ্যের দিক থেকেও স্বাধীন রাষ্ট্র হায়দারাবাদের সম্মান ছিল অনেক উঁচুতে। হায়দারাবাদের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার ছিল। নিজস্ব মুদ্রাব্যবস্থা ছিল। সেনাবাহিনী ছিল। আইন, আদালত, বিচারব্যবস্থা ছিল। হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, শুল্ক বিভাগ ছিল। নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় ও ভাষা ছিল। নিজস্ব পতাকা ছিল। জাতীয় সংগীত ছিল। পৃথিবীর দেশে দেশে নিজস্ব রাষ্ট্রদূত ছিল। জাতিসংঘে নিজস্ব প্রতিনিধি ছিল। সব ভারতের আগ্রাসী তাণ্ডবে মুহূর্তে মিথ্যা হয়ে গেল।

নিঃস্ব, রিক্ত, দুঃখী, পরাধীন হায়দারাবাদে আর থাকব না বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। তারপর কিছু বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে ভারত-অধিকৃত হায়দারাবাদ থেকে রাতের অন্ধকারে পালালাম। তার পর নানা ঘাটে দোল খেতে খেতে এলাম লন্ডনে। সেই যে এলাম...!'

সৈয়দ কুতুব উদ্দিন আবার থামেন। এরই মধ্যে রাতের খাবারের ডাক আসে। আমি ও নাইমুল একসঙ্গে সৈয়দ কুতুবউদ্দিনের দিকে তাকাই। বুকে হাত বোলাতে বোলাতে আবার কথা শুরু করেন—

'আমার এই বুকের ভেতরে অনেক জ্বালা, অনেক কষ্ট, অনেক স্বজন হারানোর কান্না। এগুলো আমার মধ্যে সারাক্ষণ দগদগে ঘায়ের মতো জ্বলতে থাকে। আমি ঘুমুতে পারি না বহুদিন। কাউকে যে বলে একটু হালকা হব, সে উপায়ও নেই। দরদি মানুষ কোথায়? ৭৮ বছর বয়সে এসেও আমি আজও ভুলতে পারিনি জেবুন্নেসার সেই শেষ বিদায়ের মুখটা। আমাকে বলেছিল, "তোমাকে আল্লাহর হাতে সঁপে দিলাম। বিজয়ী হয়ে ফিরে এসো।" আমি বিজয়ী হতে পারিনি বলেই হয়তো ভারতীয় সৈনিকরা আমার জেবুন্নেসাকে শিয়াল-শকুনের মতো কামড়ে কামড়ে খেয়েছে!'

লন্ডনের তুষারপাতের মধ্যে এবার নেমে আসে অঝোর শ্রাবণ। বৃদ্ধের দুই চোখ দিয়ে বহুদিন পরে যেন উপচিয়ে নেমে আসে অবিরল পানির ধারা। রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠস্বর। তবুও ভাঙা গলায় আবৃত্তি করতে থাকেন মীর তকী মীরের গজল—

হু শমা—এ আখিরে শব্, শুন সরগুজশত মেরী,
ফির শুব্হ হোনে তকতো কিসসা হি মুখতসর হ্যায়।

[শেষ রাতের প্রদীপ আমি, শুনে নাও আমার দুঃখের কাহিনি, ভোর হতে হতে তো সবই শেষ হয়ে যাবে।]

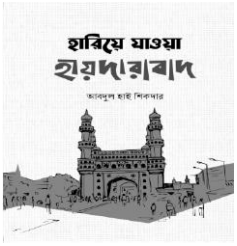

হারিয়ে যাওয়া হায়দারাবাদের 'দেশহীন মানুষ' সৈয়দ কুতুবউদ্দিনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ১৯৯৫-এ। এরপর একে একে কেটে গেছে ১৭টি বছর। এই এতগুলো বছরেও আমি ভুলতে পারিনি সেই শোকজর্জর ব্যথিত স্বজনহারা বৃদ্ধের অশ্রুসিক্ত চোখ দুটি। তার দুটি চোখের মধ্যে যে সর্বস্বহারা হাহাকার, স্বাধীনতা হারানোর যে কষ্ট আমি দেখেছিলাম, আজ এতগুলো বছর পর সেই কষ্টের অনুরণন আমি দেখতে পাচ্ছি আমার ভেতরে। আমার স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে আর্তরক্তাক্ত একটি অ্যাম্বুলেন্স যেন গত কিছুদিন থেকে ছুটে বেড়াচ্ছে। যেন কোথাও কোনো সাইরেন আমার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে আতঙ্ক, ভীতি ও সন্ত্রাস। একটা অশনিসংকেত। সে ভয় গত কয়েক দিনে আমাদের স্থানীয় সরকার মন্ত্রী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা গওহর রিজভী এবং মশিউর রহমানদের কথায় আরও বেড়ে গেছে। বাংলাদেশকে আমাদের শাসকরা কি হায়দারাবাদের মতো পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে? আমাদের লাখ লাখ শহীদের রক্তভেজা জাতীয় পতাকাকে আমরা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারীদের হাত থেকে বাঁচাতে পারব তো? বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা যে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন, সে সম্পর্কে জনগণ সচেতন কতটুকু? নাকি ১৭৫৭ সালের ২৩ জুনের পলাশি যুদ্ধের সময়কার পরিস্থিতি চারদিকে? বাংলাদেশের স্বাধীনতা ষড়যন্ত্রকারীরা তুলে দিচ্ছে বিদেশিদের হাতে, আর বাংলাদেশের মানুষ ব্যস্ত নিত্যনৈমিত্তিক কাজ নিয়ে। পলাশির পাশের মাঠে কৃষক হাল দিচ্ছে জমিতে, বটতলায় বসে গুরু মহাশয় জ্ঞান দিচ্ছেন টোলের ছাত্রদের।

আমাদের দেশের লোকজন বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্ম সিকিমের কথা কিছু জানলেও হায়দারাবাদের প্রসঙ্গ তাদের অজানাই। এই বিষয়ে জানানোর কোনো উদ্যোগও যেমন কেউ কোনো দিন নেয়নি, তেমনি জানার পথও খুব সংকীর্ণ। অথচ বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সিকিমের চেয়েও বেশি মিল হায়দারাবাদের। ১৯৪৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ভারতীয় আগ্রাসী হানাদার বাহিনীর হাতে পতনের আগে হায়দারাবাদের রাজনীতিবিদ, আমলা, সমরনায়ক, ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যা যা করেছিল, তার অনেক কিছুর সঙ্গে আমাদের মিল দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাই।

সেজন্যই আমার সব সময় মনে হয়েছে হায়দারাবাদ হারিয়ে যাওয়া কোনো অতীত নয়, মুছে ফেলা কোনো দেওয়ালের লিখন নয়। ফেলে দেওয়া কোনো ক্যালেন্ডারের পাতা নয়। হায়দারাবাদ আমাদের জন্য জীবন্ত ইশতেহার, ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা, পথচলার মাইলফলক, জাতীয় জীবনের শিক্ষণীয় ইতিহাস। হায়দারাবাদের করুণ পরিণতি

আমাদের অনেক কিছু বলতে চায়, অনেক কিছুর ইঙ্গিত করে। তাইতো আজ এতদিন পর হায়দারাবাদের ইতিহাস আমাদের সামনে ফিরে ফিরে আসছে। সেজন্যই বারবার বলা হয়, ইতিহাস কেবল অতীত নয়, এককথায় একটি জাতির ভবিষ্যৎও। খননকাজ চালিয়ে বিলুপ্ত ইতিহাসকে উদ্ধার করে যতই স্বস্থানে স্থাপন করা যাবে, জাতির আত্মার রূপরেখা নির্মাণের কাজটি ততই সহজতর হবে। ১৯৯৫ সালে ফিরে এসে বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময় করেছি। কথা বলেছি। তাদের বেশির ভাগই বলেছেন, হায়দারাবাদের ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে আমাদের কী লাভ? তা ছাড়া দুদিন আগে হোক পরে হোক, ভারত হায়দারাবাদ গ্রাস করতই।

আমার কথা ছিল, পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর অতীত ও বর্তমান ভালোভাবে জানা থাকলে কেউ একজন কম ভুল করে। হায়দারাবাদ নিয়ে কথা বলার অর্থ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা নয়। কী কী ভুলে কোন কোন পথ দিয়ে বিপদ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে, সে সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করাই এখানে লক্ষ্য। জনসাধারণকে সচেতন করার পাশাপাশি প্রয়োজনে সতর্ক করা হতে পারে। এটাই হায়দারাবাদ পর্যালোচনার অর্থ। আর দুদিন আগে-পরে ভারত হায়দারাবাদ গ্রাস করতই বলে যদি নির্লিপ্ত থাকেন, তাহলে তো বলতেই হয়—বাংলাদেশের সামনে ঘোর বিপদ। এখানেও তো কেউ বলতেই পারে, দুদিন আগে আর পরে ভারত বাংলাদেশকে গ্রাস করতই। এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন উদাসীন উক্তি প্রমাণ করে, আমাদের সাবধান হতেই হবে।

আজকের মতো ১৯৯৮ সালেও শেখ হাসিনার সরকার ভারতকে ট্রানজিট- করিডোর দেওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। সে সময় আমার মনে হয়েছিল, এর বিপজ্জনক দিক সম্পর্কে জনগণকে জানাতে হবে। আমি হায়দারাবাদ পতনের কারণ ও আজকের বাংলাদেশ রক্ষার জন্য করণীয় সম্পর্কে এক সেমিনারের আয়োজন করি জাতীয় প্রেস ক্লাবে। তারিখটা ছিল ১৩ সেপ্টেম্বর। সে সময় হায়দারাবাদের ওপর একটি প্রবন্ধ লেখানোর জন্য যোগাযোগ করি ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন ইতিহাসের অধ্যাপকের সঙ্গে। তাঁরা প্রত্যেকেই আমাকে নিরাশ করেন। কেউ বলেছেন, প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত হাতে নেই। কেউবা বলেছেন, দেশের যে সঙ্গিন অবস্থা, এই সময়ে ভারতবিরোধী লেখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কেউবা হাত-পা ঝেড়ে বলেছেন, এসব লিখে কী হবে? শেষ পর্যন্ত এগিয়ে আসেন আমাদের সবারই প্রিয় মানুষ আরিফুল হক। অভিনেতা, নাট্যকার, নাট্যনির্দেশক আরিফুল হক। যদিও তিনি প্রচলিত অর্থে গবেষক বা ইতিহাস গবেষক ছিলেন না, তবুও সংকটকালের আহ্বান তিনি উপেক্ষা করেননি। আরিফুল হক ভাই এক সপ্তাহ খাটাখাটনি করে তৈরি করলেন একটা প্রবন্ধ। সেটা পাঠ করলেন সেমিনারে।

আরিফুল হক ভাই বললেন, ভারত পরিচালিত হয় তাদের রাষ্ট্রগুরু কৌটিল্যের বিধান ও উপদেশকে শিরোধার্য করে। সেই কোটিল্য, যিনি চাণক্য নামেও পরিচিত, ভারতের রাজা ও শাসকদের বলে গেছেন, ক্ষমতা অর্জনের লোভ এবং অন্য দেশ বিজয়ের আকাঙ্ক্ষাকে কখনো মন থেকে মুছে যেতে দেবে না। সব সীমান্তবর্তী রাজাকে শত্রু মনে করতে হবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোকে বাদ দিয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে। সারা পৃথিবী চাইলেও তুমি নিজে শান্তির কথা চিন্তা করতে পারবে না। তবে বাহ্যিকভাবে শান্তি এবং সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের ভান করে নিজের আসল উদ্দেশ্য আড়াল করার অভিপ্রায়ে একে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করা যাবে।

এই দর্শনের বিষময় ফল ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলো আজও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ভারত আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করে একে একে গ্রাস করে ফেলে জুনাগড়, মানভাদ ও হায়দারাবাদকে। পরে সিকিমকে। আর আজ ভারতের প্রতিবেশী প্রতিটি দেশ নানাভাবে ভারতীয় আগ্রাসনের শিকার, অথবা ভারত কর্তৃক নানাভাবে নির্যাতিত। এই অশুভ আগ্রাসনের বিপদ সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মকে জানাতেই আমি লিখব।

আরিফুল হকের তখন ধ্যানজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায় ভারতীয় আগ্রাসনের স্বরূপ উন্মোচনের জন্য নিরন্তর কাজ করে যাওয়া। তার কথা ঠিকই। রবীন্দ্রনাথ এই উপমহাদেশের শক, হুন, মুঘল, পাঠানকে এক দেহে লীন করতে চেয়েছিলেন। পণ্ডিত নেহরু স্বপ্ন দেখতেন, প্রশান্ত মহাসাগর থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত সব এলাকা একদিন ভারতের একচ্ছত্র দখলে চলে আসবে। তখন স্বাধীন সত্তা নিয়ে ছোটো ছোটো দেশগুলো টিকে থাকতে পারবে না। গান্ধী উপমহাদেশের সংস্কৃতিকে অভিন্ন বলে জানতেন। রবার্ট বায়রন তার *দ্যা স্টেটসম্যান অব ইন্ডিয়া* গ্রন্থে লিখেছেন—'বাল গঙ্গাধর তিলক বলেছেন, এই উপমহাদেশের মুসলমান অধিবাসীরা হলো বিদেশি দখলদার, কাজেই তাদের শারীরিকভাবে নির্মূল করতে হবে।' কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনী বলেছিলেন, 'কংগ্রেস বা ভারতীয় জাতি কখনোই অখণ্ড ভারতের দাবি পরিত্যাগ করবে না।' ভারতের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল বলতেন—'আজ হোক কাল হোক আমরা আবার এক হব এবং বৃহৎ ভারতের প্রতি আনুগত্য দেখাব।'

মোটকথা, চরিত্রগতভাবেই ভারত তার আশপাশের কোনো জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ১৯৪৭ সালের ৫ এপ্রিল হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে তারকেশ্বরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনে সর্বভারতীয় হিন্দু নেতা সাভারকার এক বাণীতে বলেছিলেন—'প্রথমত পশ্চিমবঙ্গে একটা হিন্দু প্রদেশ গঠন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, যেকোনো মূল্যে আসাম থেকে মুসলিমদের বিতাড়ন করে এই দুটি হিন্দু প্রদেশের মাঝে ফেলে পূর্ব পাকিস্তানকে পিষে মারতে হবে।'

এই সাম্প্রদায়িক দর্শন থেকেই ১৯৪৭ সালে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে গঠন করা হয় হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গ। ১৯৪৭ থেকে ৮৫ সালের মধ্যে আসাম থেকে মুসলিম বিতাড়ন প্রক্রিয়াও শেষ করা হয়েছে। এখন পিষে ফেলতে বাকি আছে বাংলাদেশ। তারই প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে ভারত। এই সময় হায়দারাবাদের দৃষ্টান্ত আমাদের সতর্ক হওয়ার সুযোগ করে দেবে বলে বিশ্বাস করি।

সে সময় আরিফুল হকের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে আমরা বেশ কটি বড়ো বড়ো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র‍্যালির আয়োজন করি, যা ছিল বাংলাদেশের সমকালীন ইতিহাসে অভূতপূর্ব। পরে ষড়যন্ত্রের জালে আটকে যায় সব আয়োজন। হতাশা ঘিরে ধরে আমাদের।

আরিফুল হক তখন থাকতেন তার শাহীনবাগের বাসায়। এখান থেকেই হঠাৎ একদিন তিনি দেশের রাজনীতি এবং সাংস্কৃতিক যোদ্ধাদের অজ্ঞতা, মূর্খতা, স্বার্থপরতা ও হানাহানি দেখে অতিষ্ঠ হয়ে অনেকটা অভিমান করে চলে যান কানাডায়। তারপর বহুবার তাকে ফিরে আসার অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি ফিরে আসেননি। ২০০১ সালে চারদলীয় জোট ক্ষমতায় এলে তাকে ফিরিয়ে আনার এক জোর প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। সে সময় তাকে গুরুত্বপূর্ণ পদ-পদবি দিয়েও সম্মানিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু তার এককথা—আমি ফিরছি না। একটি পরাজিত যুদ্ধের দর্শক হওয়ার কোনো রকম ইচ্ছে আমার নেই।

আমাদের অনুরোধ এবং পীড়াপীড়ির জবাবে তিনি বলতেন—'ভাইরে, একদিন সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বাঁচার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে হিজরত করে বাংলাদেশে এসেছিলাম। সেই বাংলাদেশ আজ নিজের লোকদের কারণেই ভেতর থেকে ভঙ্গুর হয়ে যাচ্ছে। রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, প্রশাসন— সর্বত্র এখন চলছে নৈরাজ্য। এই নৈরাজ্য ভারতের ইঙ্গিতে, ভারতের অর্থে বাংলাদেশের একশ্রেণির অবিমৃশ্যকারী রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, আমলা ও লেখক-শিল্পীর দ্বারা সূচিত হয়েছে। জাতি হিসেবে বাংলাদেশিদের বিপন্ন করার জন্য পুরো দেশের সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বিভেদ, হানাহানি ও ঘৃণা। পরিষ্কারভাবে বাংলাদেশ আজ দু-ভাগে বিভক্ত। জাতীয় ঐক্য ও সংস্কৃতির প্রদীপ নিভুনিভু করে জ্বলছে। যারা দেশপ্রেমিক তারা আজ উপেক্ষিত। যারা ভারতীয় আগ্রাসনকে ত্বরান্বিত করার জন্য কাজ করছে, তাদের 'হিরো' হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের বিরাট অংশ ভারতের দালালিতে লিপ্ত। গণমাধ্যমগুলোর মাধ্যমে এমনভাবে সিন্ডিকেটেড প্রচার-প্রচারণা চলছে, সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে বিভ্রান্তি। তারা আজ অনুধাবন করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে—কোনটি সঠিক, কোনটি বেঠিক। আমাদের রাজনীতিবিদদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভারতের পায়ের ওপর সিজদায় পড়ে আছে।

এ রকম অবস্থায় আমার মতো একজন সাধারণ সংস্কৃতিকর্মী আর কী করতে পারে? আমি তো সব খ্যাতি-প্রতিপত্তি পাশ কাটিয়ে, মঞ্চের হাতছানিকে ভ্রুক্ষেপ না করে মাঠে নেমে এসেছিলাম। জনগণের মধ্যে কাজ করতে চেয়েছিলাম। লাভ কী হলো? যাদের নিয়ে কাজ করার জন্য সব ত্যাগ করে এসেছিলাম, তারা আমাকে ন্যূনতম সম্মানটুকুও দেয়নি। কদর করেনি। উলটো বোঝাতে চেয়েছে, আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই বলে এখানে এসেছি। সত্যি বলছি, শেষের দিকে নিজেকে বড়ো বেশি অবাঞ্ছিত মনে হতো। আমি চরমভাবে হতাশ হয়ে পড়ি। অথচ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম, রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের টিকে থাকার পাটাতনগুলো এক এক করে অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে ধ্বংস করা হচ্ছে। আর প্রতিদিন বাংলাদেশ ঢুকে পড়ছে ভারতীয় আগ্রাসনের আরও গভীরে, আরও গভীরে!

অসহায়ভাবে এই দৃশ্য দেখার জন্য আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, নিজেকে দর্শকের ভূমিকায় দেখতে হবে—এটা আমার সহ্য হয়নি। যে আবেগ ও আশা নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলাম, তা-ই যখন থাকল না, তখন আর বাংলাদেশে থেকে কী হবে? তাইতো আমি আবার যাযাবর হলাম। চলে এসেছি কানাডায়।

এখানে আমার কোনো কাজ নেই। আমি এদের কেউ নই। সেও ভালো। সে আমার সয়ে যাচ্ছে। এখানে কেউ নিজেদের কবর নিজেরা খোঁড়ে না। এখানে ভাড়াখাটা রাজনীতিবিদ নেই। ভাড়াখাটা বুদ্ধিজীবী নেই, কবি-লেখকও নেই। এখানে চারপাশে কোনো ভারত নেই বলে কোথাও কোনো অশান্তি নেই। বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে আছি বলে দেশের দুর্ভাগ্য আমাকে তাড়িত করে না। দৈনন্দিন দাহগুলো আমাকে পোড়াতে পারে না। বাংলাদেশ যদি কোনো নাটকের নাম হয়, তাহলে তার শেষ অঙ্ক দেখার জন্য আমাকে আর কষ্টে কঁকিয়ে উঠতে হবে না। বিশ্বাস করুন, যে নিদারুণ দুঃখ, কষ্ট ও যাতনা ভোগ করেছেন সৈয়দ কুতুবউদ্দিন, সেই কষ্ট আমার এই বয়সে আমি আর সহ্য করতে পারব না। আমাকে দূরেই থাকতে দিন।'

আরিফুল হকের মতো মহাপ্রাণ মানুষ বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে বেঁচেছেন। তার একটা যাওয়ার জায়গা ছিল কানাডাতে। তিনি সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে পেরেছেন। কিন্তু আমার-আপনার মতো আমজনতা কোথায় যাবে? আমাদের তো পালিয়ে বাঁচারও জায়গা নেই। যেহেতু আমাদের পালিয়ে যাওয়ার জায়গা নেই। অতএব, আমাদের কাজ হবে মাতৃভূমির রাষ্ট্রিক ভিত্তি, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য নিরন্তর কাজ করে যাওয়া। সে কাজের কে মূল্য দিলো, কে দিলো না, সে হিসাব-নিকাশ করে লাভ নেই। তাহলে হতাশা আসবে এবং আরও অরক্ষিত হয়ে যাবে দেশ। তা আমরা হতে দিতে পারি না। তাই যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে বাংলাদেশের সরাব জঞ্জাল। তারপর ইতিহাসের হাতে সমর্পণ করব নিজেদের।

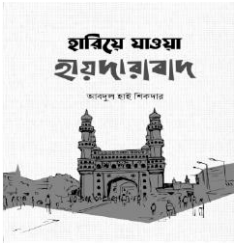

হায়দারাবাদ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আবারও মনে পড়ল গালিবের কবিতা—

নাহ্ গুলে নগমহ্ হু, না পরদহ সাজ,
মৈ, হু আপনি শিকস্ত-কী আওয়াজ।

[কবিতার ফুল নই, সেতারের পরদা নই। আমি কেবল একটি আওয়াজ, পরাজয়ে ভেঙে পড়ার আওয়াজ।]

শুধু যে পরাজয়ে ভেঙে পড়ার আওয়াজ তা-ই নয়। মৌনতার আবরণে ঢাকা একটি গোরস্থানের নিভে যাওয়া প্রদীপ হলো হায়দারাবাদ।

যে 'কোহিনূর' হীরক খণ্ড নিয়ে পৃথিবীজুড়ে তুলকালাম, ১৮৫৭ সালে দিল্লি লুণ্ঠনের সময় যে পৃথিবীর জ্যোতিকে লুট করে নিয়ে গেছে সাদা চামড়ার ঔপনিবেশিক ব্রিটিশরা, সেই কোহিনূরের জন্মভূমি হায়দারাবাদ। গোদাবরী, কৃষ্ণা, তুঙ্গভদ্রা, পূর্ণা, ভীমা, পেনগঙ্গা, ওয়ার্ধা, মুসী, প্রাণহিতার মতো নদী যে হায়দারাবাদকে করেছে সুজলা-সুফলা—সেই হায়দারাবাদেই আছে ইতিহাসখ্যাত অজন্তা ইলোরা গুহা। আওরঙ্গাবাদ, ওসমানাবাদ, গোলকুণ্ডা, গুলবার্গা, রাইচুর, পারেন্দা, সুদগল প্রভৃতি দুর্গ হায়দারাবাদকে দিয়েছিল ঐশ্বর্য। আবার হীরক, স্বর্ণ, লৌহ, কয়লা ও অভ্রের খনি হায়দারাবাদকে করেছিল সমৃদ্ধ। পাশাপাশি মক্কা মসজিদ, চার মিনার যে রাষ্ট্রকে দিয়েছিল আভিজাত্য; সেই হায়দারাবাদ এখন এক নিঝুম গোরস্থান, এক নিভে যাওয়া প্রদীপ। আজকের নব্য ভারতীয়দের প্রচণ্ড কোলাহলের নিচে চাপা পড়ে গেছে হায়দারাবাদের প্রাণ। সবকিছুই এখন স্মৃতি, ধূসর স্মৃতি।

হায়দারাবাদের আয়তন ছিল ৮২ হাজার ৬৯৮ বর্গমাইল। হায়দারাবাদের উত্তরে ছিল ভারতের মধ্য প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিমে মহারাষ্ট্র। দক্ষিণে কৃষ্ণা, তুঙ্গভদ্রা নদী, পশ্চিমে আহমদনগর, বিজাপুর। পূর্বে ছিল তামিলনাড়ু। এই সীমানা ও আয়তন ১৯৪৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর হায়দারাবাদের পতনের সময়কার। অতীতের হায়দারাবাদ ছিল আরও বড়ো একটি দেশ। দাক্ষিণাত্যের এই দেশটির ইতিহাসও অনেক প্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের দ্রাবিড় সভ্যতা এই রাষ্ট্রেরই পূর্বাঞ্চলসহ সমগ্র দক্ষিণ ভারতে ব্যাপ্ত ছিল। আজকের তেলেগুভাষীরা সেই দ্রাবিড়দেরই উত্তর-পুরুষ।

রোমে যেমন শাসককে বলা হতো সিজার, রাশিয়ায় যেমন জার, সেই রকম হায়দারাবাদের শাসকদের উপাধি ছিল 'নিজাম'। হায়দারাবাদ এবং নিজামশাহী আমল

একই ইতিহাসের এপিঠ-ওপিঠ। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের কৃতী সেনাপতি ছিলেন মীর কমরউদ্দিন খান আসফজাহ। ১৭১৩ সালে আওরঙ্গজেব তাকে নিজাম-উল-মুলক উপাধি দিয়ে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার নিযুক্ত করে পাঠান। তারপর আওরঙ্গজেবের পর নানা উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে ১৭২৪ সালে এই দাক্ষিণাত্যেই স্বাধীন-সার্বভৌম হায়দারাবাদ রাষ্ট্রের পত্তন করেন আসফজাহ। শুরু হয় আসফজাহ বংশের নিজামদের শাসন।

প্রথম নিজাম মীর কমরউদ্দিন খান আসফজাহের মৃত্যুর পর তার দ্বিতীয় ছেলে মীর আহমদ খান নাসির জং এবং কন্যা খায়রুন্নিসার ছেলে মুজফফর জঙ্গের মধ্যে শুরু হয় উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্ব। হায়দারাবাদের সিংহাসন নিয়ে এই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে বহিরাগত ইউরোপীয় বণিকরা। ইংরেজ বণিকরা নাসির জঙ্গের পক্ষে এবং ফরাসিরা মুজফফর জঙ্গের পক্ষ নেয়। শেষ পর্যন্ত মুজফফর জং পরাজিত ও বন্দি হন। দু-বছর পর নাসির জং আততায়ীর হাতে নিহত হলে মুজাফফর জং নিজেকে হায়দারাবাদের নিজাম হিসেবে ঘোষণা করেন। এভাবেই স্বাধীন হায়দারাবাদের ওপর বিদেশি হস্তক্ষেপের পথ সুগম হয়।

সেই সময়কার উপমহাদেশের দিকে তাকানো যেতে পারে। বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য অস্তাচলগামী। দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়েছে। সেই সুযোগে সমগ্র উপমহাদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শুরু হয়েছে ভ্রাতৃঘাতী হানাহানি। মন্ত্রী, সমরনায়কদের বিশ্বাসঘাতকতা। অন্যদিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে হিন্দু মারাঠা শক্তি। বাংলায় ততদিনে ঘটে গেছে ভয়ংকর পালাবদল। ১৭৫৭ সালে পলাশির প্রান্তরে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মীরজাফরের ঘাড়ে চেপে বাংলা বিহার উড়িষ্যার ক্ষমতা দখল করে বসেছে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তারা উপমহাদেশের মূল কেন্দ্রবিন্দুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। দেশীয় রাষ্ট্রগুলোর নিজেদের ভেতরকার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং এক দেশের বিরুদ্ধে অপরের বিদ্বেষ ও ঘৃণা পুঁজি করে সে সময় ইংরেজ ও ফরাসি বণিকরা বাড়িয়ে নিচ্ছিল নিজেদের প্রভাব। নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োগ করছিল নানামাত্রিক কূটকৌশল, বিস্তার করছিল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জাল। এই জালে একে একে জড়িয়ে পড়তে থাকে দেশীয় স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো। এভাবেই হায়দারাবাদের ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে আবির্ভূত হয় ঔপনিবেশিক ইংরেজ বণিকরা। কর্ণাটকের যুদ্ধে ক্লাইভের সাফল্যের পর ইংরেজরা হায়দারাবাদের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ মজবুত করার জন্য আসফ জাহের তৃতীয় ছেলে সালাবত জংকে (১৭৫১-১৭৬২) ক্ষমতায় বসায়। কিছুদিন পর তাকে সিংহাসনচ্যুত করে চতুর্থ ছেলে নিজাম আলি খানকে হায়দারাবাদের 'নিজাম' করে (১৭৬২-১৮০৩)।

ইংরেজ বণিকদের এই বশংবদই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষাবলম্বন করে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। তাকে পরাজিত ও নিহত করার পেছনে হায়দারাবাদের নিজাম আলি খানের যে ঘৃণ্য ভূমিকা, তা ভারতের জাতীয় ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়।

এর পেছনে আরও কারণ বিদ্যমান। ইংরেজরা তখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা ছাড়িয়ে একে একে কবজা করে নিচ্ছিল ছোটো ছোটো স্বাধীন রাজ্যগুলো। দাক্ষিণাত্য চলে যায় ইংরেজদের দখলে। হিন্দু মারাঠা শক্তি ইংরেজদের সাহায্যে সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসে। এ রকম পরিস্থিতিতে ১৭৬৮ সালে ইংরেজদের সঙ্গে এক অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে নিজাম আলি খান। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী হায়দারাবাদের চারটি অঞ্চল চলে যায় ইংরেজদের দখলে। ইংরেজরা নিজস্ব সৈন্যবাহিনী রাখার অধিকার পায়। আর উভয়পক্ষের কোনো এক পক্ষ অন্য কারও সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে একপক্ষ অন্য পক্ষকে সর্বাত্মক সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে মর্মে একটা চুক্তি হয়। এ রকম চুক্তির কারণেই ৪র্থ মহীশূর যুদ্ধে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করেছিল নিজাম।

সে সময় হায়দারাবাদের আয়তন ছিল আজকের ফ্রান্সের সমান। কিন্তু ইংরেজরা নানা ছলচাতুরী করে প্রতি বছরই একটু একটু করে গ্রাস করতে থাকে দেশটি। এভাবে হায়দারাবাদের হাতছাড়া হয়ে যায় বেরার প্রদেশ, কুড্ডাপপা, কুনুল, বেলারি, অনন্তপুর জেলা। বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলো, যার মাধ্যমে হায়দারাবাদ সংযুক্ত ছিল সমুদ্রের সঙ্গে, সেগুলো একে একে হাতছাড়া হয়ে যায়। সমুদ্রপথ বন্ধ হয়ে হায়দারাবাদ চারদিক থেকেই স্থলবন্দি হয়ে পড়ে, যা পরবর্তী সময়ে তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

গবেষক আরিফুল হক বলেছেন, সেদিন হায়দারাবাদের নিজামরা যেমন ভুল করে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের সমুদ্রবন্দর বিদেশিদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেরা গৃহবন্দি হয়ে পড়েছিলেন, তেমনি আজকের বাংলাদেশও পার্বত্য শান্তিচুক্তির নামে পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরসহ সম্পূর্ণ কক্সবাজার উপকূল ভারতের প্রভাববলয়ে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা গৃহবন্দি হতে চলেছে। এ যেন একই নীলনকশার পুনরাবৃত্তি। অথচ আমরা এই নীলনকশা পড়তে বা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হচ্ছি। প্রত্যেক জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, কোনো জাতির জীবনে যখন অধোগতির চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণ এগিয়ে আসে, তখন সে এভাবেই অসচেতন হয়ে আপন ভুলের আবর্তে আপনিই তলিয়ে যায়, যেমন হায়দারাবাদ গিয়েছিল।

এ রকম টানাপোড়েনের ভেতর দিয়েই এগিয়ে এলো ১৯৪৭ সাল। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, ভারতকে হিন্দু ও মুসলমান প্রধান দুটি এলাকায় ভাগ করে

দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে। তারপর তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে ভারত ছেড়ে যাবে ব্রিটিশরা।

গবেষকরা বলছেন, এ সময় আর একটি সমস্যা সামনে চলে আসে। তা হলো দেশীয় রাজ্য সমস্যা। সে সময় ভারতে কয়েক শ দেশীয় রাজ্য ছিল। যেগুলো ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বিশেষ চুক্তির আওতায় পরিচালিত হতো। ভারত দু-ভাগে বিভক্ত হলে এই স্বাধীন করদরাজ্যগুলোর ভবিষ্যৎ কী হবে? সে সময় ব্রিটিশ সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ ভারতে নিযুক্ত শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে বাকিংহাম প্যালেসে ডেকে নিয়ে তার উৎকণ্ঠার কথা জানিয়ে বলেন—'দেশীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে ব্রিটেনের সরাসরি সন্ধি রয়েছে। ভারত স্বাধীন হয়ে গেলে এই সন্ধির ইতি ঘটবে। সেক্ষেত্রে দেশীয় রাজ্যগুলোর বেলায় বিরাট শূন্যতা দেখা দেবে। তখন ওই রাজ্যের রাজারা গভীর সংকটে পতিত হবে। সুতরাং ওরা যাতে স্বাধীন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে, সে বিষয়টি যেন বিশেষভাবে দেখা হয়।'

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে ভারতীয় প্রদেশগুলো ও দেশীয় মিত্র করদরাজ্যগুলোকে নিয়ে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেছিল ব্রিটিশরা। সে প্রস্তাবে গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া অ্যাক্টে হায়দারাবাদকে স্বাধীন মর্যাদা দান করে বলা হয়েছিল, দেশীয় রাজ্যগুলোর পদমর্যাদা এবং স্বাভাবিক কার্যাবলি স্বাধীন ভারতের কাছে, রাজ্যগুলোর অনুমতি ব্যতিরেকে হস্তান্তর করা যাবে না।

১৯৪৭ সালে প্রণীত ভারত স্বাধীনতা আইনে বলা হলো, ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পর দেশীয় রাজ্যগুলোর ওপর থেকে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ অবসানের পর রাজ্যগুলো ইচ্ছামতো ভারত অথবা পাকিস্তান ডোমিনিয়নে যোগ দিতে পারবে অথবা স্বাধীন থাকতে পারবে।

১৯৪৭ সালের ১৬ জুলাই লন্ডনে ভারতবিষয়ক সচিব লর্ড লিস্টোয়েল লর্ড সভায় বলেছিলেন—'এখন থেকে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলো থেকে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি প্রত্যাহার এবং তাদের দাফতরিক কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। দেশীয় রাজ্যগুলো ভারত, পাকিস্তান ডোমিনিয়নের কোনটিতে যোগ দেবে অথবা একক স্বাধীনসত্তা বজায় রাখবে, তা সম্পূর্ণ তাদের স্বাধীন ইচ্ছাধীন। ব্রিটিশ সরকার এ বিষয়ে কোনো রকম প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করবে না।' ১৯৪৭ সালের ৯ জুলাই অর্থাৎ ভারত সচিবের বক্তব্য দেওয়ার আগেই নিজাম অবশ্য শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যানেলেঞ্জানিয়ে দেন—ব্রিটিশরাজ ও হায়দারাবাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক হায়দারাবাদ তার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায়। এভাবেই ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা আইন পাসের সঙ্গে সঙ্গে হায়দারাবাদের ওপর ব্রিটিশ খবরদারির অবসান ঘটে। যেহেতু হায়দারাবাদ ও ব্রিটিশদের মধ্যে পূর্বের চুক্তিগুলো ব্রিটিশরাই বাতিল

ঘোষণা করেছিল, সেহেতু কোনো ধরনের চুক্তি দ্বারাই হায়দারাবাদ আর আবদ্ধ থাকল না।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়া হলো। ১৫ আগস্ট গোলামির চিহ্ন মাথায় নিয়ে, অর্থাৎ লর্ড মাউন্টেন ব্যাটেনকেই ভারতের গভর্নর জেনারেল করে স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠিত হলো। ওই দিন হায়দারাবাদও তার স্বাধীনতা ঘোষণা করল। অর্থাৎ, ওইদিন থেকেই হায়দারাবাদ ভারত ও পাকিস্তানে মতোই একটি স্বাধীন দেশের মর্যাদা লাভ করল।